গুরুবায়ুর সত্যাগ্রহ : নানা চোখে

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

ঘটনাটা ১৯৩২-৩২ সালের। কেরলের গুরুবায়ু মন্দিরে সব জাতের ঢোকার অধিকার নিয়ে আন্দোলন চলছে। মন্দিরে তথাকথিত নিচু জাতের ঢোকার এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল মহারাষ্ট্রের নাসিকে, কালারাম মন্দির থেকে (মে ১৯৩০, তার আগেও ১৯২৭-এ,) মাহাদ-এর বীরেশ্বর মন্দিরে অচ্ছুতদের ঢোকা নিয়ে গুজব ছড়িয়েছিল। ১৯-২০ মার্চ, ১৯২৭ -এ অচ্ছুতদের সম্মেলনে বর্ণহিন্দুরা চড়াও হয়। কয়েকজনকে মারধোরও করা হয়। প্রাণ বাঁচাতে প্রতিনিধিরা আশ্রয় নেন মুসলমানদের বাড়িতে। বাবাসাহেব আম্বেডকরকেও এক থানায় ঢুকে পড়তে হয়েছিল।

১৯৩০ -এ কালারাম মন্দিরের সত্যাগ্রহে যোগ দিয়েছিলেন পনেরো হাজার পুরুষ স্বেচ্ছাসেবক আর পাঁচ মহিলা। চার সারিতে এক কিলোমিটারের বেশি লম্বা মিছিল করে তাঁরা গিয়ে পৌঁছলেন মন্দিরের দরজায়। দরজা স্বভাবতই বন্ধ ছিল। সত্যাগ্রহীরা তার গোদাবরীর ঘাটের দিকে চললেন। যথারীতি বর্ণহিন্দুরা তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন পাথর আর জুতো ছুঁড়ে। এইভাবেই সমস্ত জলাশয়ের জল তোলার অধিকার, মনুসংহিতা-র কপি পোড়ানো ইত্যাদির সঙ্গে মন্দির প্রবেশ সত্যাগ্রহ হয়ে উঠেছিল আম্বেডকরের কর্মসুচির অঙ্গ।

এতে প্রমাদ গনলেন গাঁধিজী। এতকাল তিনি ছিলেন বর্ণাশ্রম ধর্মর সমর্থক। এবার তিনিও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে বিবৃতি দিতে শুরু করলেন। বোম্বাই (এখনকার মহারাষ্ট্র) আইসভায় 'হরিজন নামটিকে বিধিসম্মত স্বীকৃতি দেওয়ার বিলও আনা হলো। আম্বেডকর অবশ্য এতে ভুললেন না। আইনসভার বিতর্কে তিনি বললেন : এ হলো অস্পৃশ্য শব্দটিরই এক মিষ্টি ('sweet') নামকরণ। গাঁধিকে তিনি বললেন: অস্পৃশ্যতা - বিরোধী লিগ -এর কাজ হবে দলিত (ডিপ্রেস্‌ড্‌) শ্রেণীগুলির আর্থিক শিক্ষাগত ও সামাজিক উন্নতি করা সব জাতের মন্দির প্রবেশ আর এক আসনে বসে খাওয়া (ইন্টার - ডাইনিং) নয়।

গুরুবায়ুর মন্দির সত্যাগ্রহর এই হলো পটভূমি। তার একটি দিক (সব দিক নয়) জানা যায় গাঁধির রচনাবলি থেকে। কিন্তু সে হলো গাঁধির চোখ দিয়ে দেখা। আম্বেডকর-এর মত তো আগেই বলেছি। এবার অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি দেখা যাক। বর্ণহিন্দু, বিশেষ করে ঘোর রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পন্ডিতরা গুরুবায়ুর মন্দির প্রবেশ আন্দোলনকে কী চোখে দেখেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র পাণ্ডা (১৯০৬-১৯৯২) তখন ভাটপাড়ার তরুণ ছাত্র। তাঁর অপ্রকাশিত স্মৃতিকথায় এই ঘটনার একটি বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন (মূলের বানান ইত্যাদি অবিকৃত রাখা হয়েছে):

...ব্যাপার হইল কেরল প্রদেশ গুরুবায়ু নামক একটি বিষ্ণুমন্দির আছে। উক্ত মন্দিরে দীর্ঘাকৃতি চতুর্ভূজ বিষ্ণুমূর্ত্তি। মন্দিরের প্রায় ১০ হাত দূরে একটি প্রাচীর ও উক্ত প্রাচীর হইতে প্রায় ১৫ হাত দূরে দ্বিতীয় প্রাচীরটি সদর রাস্তার উপরে রহিয়াছে। মন্দিরের মধ্যে বেশ কয়েকটি বড় ঝাড় প্রদীপ জ্বালিয়া মন্দিরটি আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে, মন্দিরের দ্বার হইতে সোজাসুজি দুইটি প্রাচীরের দ্বারা প্রথম প্রাচীর হইতে অস্পৃশ্য প্রভৃতি সকলে মূর্ত্তি দর্শন করিতে পারে দ্বিতীয় প্রাচীর পর্য্যন্তউচ্চশ্রেণীর শূদ্রগণ প্রবেশ করিতে পারে এবং দ্বিতীয় প্রাচীর হইতে মন্দিরের পার্শ্বদেশ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণেরা যাইয়া বিগ্রহ দর্শন করেন। কেবল নাম্বোদ্রী শ্রেণীর ব্রাহ্মণই মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ ও পূজা করিতে পারেন। উক্ত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বংশজ শঙ্করাচার্য্য। কথিত আছে যে উক্ত মন্দিরটি গুরু (বৃহস্পতি) ও বায়ুদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের জমি জায়গা প্রচুর আছে ও উহার আয়ের দ্বারা সেবাপূজা চলে। মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকিল মিঃ কেলাপ্পান ইহা সর্ব্ব সাধারণের সম্পত্তি ও উহাতে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার রহিয়াছে বলিয়া ট্রাষ্টীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন কিন্তু তখন মন্দির প্রবেশ বিল্‌ পাশ না হওয়ার জন্য মামলায় পরাজিত হন ও তখন মন্দির প্রবেশের জন্য কিছু কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিয়া সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন। তখন মন্দিরের ট্র্যাষ্টীগণ মিলিত হইয়া মন্দিরের প্রাচীরের দ্বার বন্ধ রাখিয়া পূজার্চনা চালাইয়া যান। মন্দিরের ট্রাষ্ট্রী ছিল ৮০ জন। পরে অনেকে বংশহীনতার জন্য এখন প্রায় ৪৮ জন ট্রাষ্টী। জামেরিন্‌ একজন প্রধান ট্রাষ্টী এখানকার রাজাকে জামেরিন বলা

সৃষ্টিসন্ধান

হয়। ট্রাষ্টীদের মিটিং -এর স্থির হয়ে যে মন্দিরের প্রাচীরের দ্বার বন্ধ রাখিয়া পূজার্চনা চালিতে থাকিবে। তখন সত্যাগ্রহ অচল হওয়ায় মিঃ কেলাপ্পন অনশন কবিবেন স্থির করেন তখন গান্ধীজি কেলাপ্পনকে জানান যে একবৎসর তিনি জনসাধারণকে সম্মত করাইয়া ব্যবস্থা করিবেন অন্যথা তিনিই অনশন করিবেন। তাই তিনি ১৯৩২ সালের ২০শে ডিসেম্বর হইতে অনশন করিবেন স্থির করেন। গান্ধীজির মত একজন মহান্ ব্যক্তির জীবনসঙ্কটে বাঙ্গালীদের কর্ত্তব্য বিষয়ে মতিলাল রায় বাঙ্গালীর সমস্ত ধর্ম ও সমাজ প্রতিষ্ঠানকে আহ্বান করিয়া ডিসেম্বরের প্রথম দিকে একটি বিরাট সভার ব্যবস্থা করেন চন্দননগরে। উক্ত সভায় ভাটপাড়ার পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় সভাপতি ছিলেন । বঙ্গদেশের সমস্ত ধর্মপ্রতিষ্ঠান হইতে প্রতিনিধিগণ আসিয়াছিলেন। প্রথম দিন আলোচনায় যেমন পুরী, কাশী ও বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্ধ স্থানে সমস্ত জাতি মন্দিরে প্রবেশ করে ও দেবদর্শন করে গুরুবায়ু মন্দিরে ও তাহাই হউক বলিয়া সকলে বলিয়া উঠাতে তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন যে সেখানে নারদীয় পাঞ্চরত্ন নামক ধর্মশাস্ত্রে মন্দিরকে দেবতার প্রতিমূর্ত্তিরূপে বর্ণিত হইয়াছে ও সেইজন্য মন্দির প্রবেশ দেবতা স্পর্শ স্বরূপ ও সেই জন্য সেস্থানে সমস্ত জাতির মন্দির প্রবেশের বিধান নাই। প্রথম দিন সভা এগারটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত চলিল ও পর দিন সভার আরম্ভে সমস্ত প্রতিনিধিগণ একবাক্যে বলিল যে তর্করত্ন মহাশয় ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এবং তিনি শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্ক দেখাইয়া গান্ধীজিকে অনশন হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন এবং সেই জন্য সভার পর হইতে তাঁহাকে পুণায় গিয়া গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। তখন তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন যে তাঁহার বয়স হইয়াছে ও এই দুর্বল শরীরে এই শীতকালে এত দূর যাওয়া খুব কষ্টকর হইলেও যদি তাঁহার দ্বারা একটি এইরূপ বিশিষ্ট মানুষ্যের অনশন ভঙ্গ হয় সেই জন্য তিনি যাইতে রাজী আছেন। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ হইতে মতিলাল রায় মহাশয় ও আর ৪জন— তিন জন মহিলা ও অরুণচন্দ্র দত্ত। তর্করত্ন মহাশয়ের সঙ্গে আমি। আমার স্বাস্থ্য ও ক্ষমতা ভাল ছিল এবং ইংরাজীও জানি। আমরা প্রথমত: বোম্বাইতে ধনকুবের বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সঙ্ঘের কোষাধ্যক্ষ লছমীরাম চুড়িওয়ালার বাড়ীতে পৌঁছিলাম। সেখানে বহু বড় বড় পণ্ডিত দেখা করিতে আসিয়া বলিলেন ‘‘গান্ধীর হিন্দুধর্মের প্রতি কোন আস্থা নাই ও অত্যন্ত ধাপ্পাবাজ। নিজের একটি ছেলে ব্রাহ্মণের মেয়ে রাজগোপাল আচারীর মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে ও একটি ছেলে মুসলমানের মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে। গান্ধী অত্যন্ত ধাপ্পাবাজ নিজের কথার ঠিক থাকে না। সুবিধা অনুযায়ী কথার রদবদল হয়। বাঙ্গালীগণ গান্ধীকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মনে করেন। উহার সঙ্গে আপনার মত পণ্ডিতের দেখা করা শোভনীয় নয়।’’ উত্তরে তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন যে যখন সুদূর বাঙ্গালা হইতে এখানে আসিয়াছেন এবং সভার পক্ষ হইতে এই কাজের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন তখন তিনি অবশ্যই দেখা করিবেন। গান্ধী তখন জারবেদার জেলে। পুনার জেলকে জারবেদার জেল বলা হয়। বোম্বাই হইতে আমরা পুণায় রামচন্দ্রজীর বাগান বাড়ীতে সকলে পৌঁছিলাম। ইনিও একজন ধনকুবের। ইহার একমাত্র পুত্র মারা যাওয়ার ইনি বিধবা পুত্রবধু ও স্ত্রীকে লইয়া এই বাগান বাড়ীতেই থাকেন। এখানে বহু ফলফুলের গাছ আছে ও একটি বিলাতী গাই আছে প্রত্যহ ৩ সের দুধ দেয় ও তিন বার দোওয়া হয় এবং দরকার পড়িলে আরও একবার দোওয়া যাইতে পারে। সেখান হইতে জেলারকে ফোনে আমাদের সঙ্গে গান্ধীজির দেখা করার প্রয়োজন জানাইয়া সময় জানিতে চাহিলাম। পর দিন বেলা ২টা সময় দেখা করার অনুমতি মিলিল। যথা সময়ে সকলে উপস্থিত হইলাম। জেলের এক পাশে একটি ঘর ও সম্মুখে উঠান ও সেই উঠানে একটি আম গাছ আছে। একটি কম্বল আমগাছের নীচে পাতান হইল ও আমরা বসিলাম। একটি চেয়ারে তর্করত্ন মহাশয় বসিলেন ও একটি খাটিয়ায় গান্ধীজি বসিলেন। যাওয়া মাত্র গান্ধীজি তর্করত্ন মহাশয়কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। সকলে উপবিষ্ট হইলে তর্করত্ন মহাশয় বলিতে আরম্ভ করিলেন ‘‘যখন আপনি আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ করিতেছিলেন তখন আমি আপনি দীর্ঘজীবী হইয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসুন ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করুন এই উদ্দেশ্যে কাশীতে যজ্ঞ ও স্বস্ত্যয়ন করিয়াছিলাম। পুনরায় যখন আপনি অনশনের দ্বারা জীবন বিপন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছেন তখন আমি আপনাকে অনশন ত্যাগ করাইবার জন্য আসিয়াছি। এই সব কথাবার্ত্তায় প্রায় পাঁচটা হইয়া গেল এবং জেলের নিয়মানুযায়ী পর দিন আসিব বলিয়া

সৃষ্টিসন্ধান

চলিয়া আসিলাম। পর দিন ২টার সময় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ভগবানদাসজী আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন যে তর্করত্ন মহাশয়ের এখানে আসার সংবাদ শুনিয়া তিনি কাশী হইতে এখানে আসিয়াছেন এবং তিনি বলিলেন যে কাশী ও পুরীতে প্রত্যহ সমস্ত জাতির বহু নরনারী মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বিগ্রহ দর্শন করে গুরুবায়ুতেও তাহাই হউক উত্তরে তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন যে সেখানকার পরিস্থিতি আমার অজ্ঞাত তবে শুনিয়াছি যে সেখানে নারদীয় পঞ্চরত্ন একটি প্রামাণিক গ্রন্থ ও তাহার মতে মন্দিরকে দেবমূর্ত্তির প্রতিমূর্ত্তি -রূপ কল্পনা করা হইয়াছে এবং মন্দির স্পর্শ করিলে দেবমূর্ত্তিকেই স্পর্শ করা হয় বলিয়া তাহার মন্দির স্পর্শ কেবল ব্রাহ্মণ ছাড়া অপর জাতীর লোকের পক্ষে উচিত নয় বলিয়া সেইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাতে ভগবানদাসজি বলিলেন ‘‘প্রতিবৎসর কার্ত্তিকমাসের শুক্লা একাদশী হইতে তিন দিন সমস্ত জাতি প্রবেশাধিকার পায় তবে সব দিন বা হয় না কেন? উত্তরে তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন যে পুরী ও কাশীতে সন্ধ্যার পর অভিষেক দ্বারা অস্পৃশ্য - স্পৃশ্য দোষ দূর করা হয় এবং প্রতিবৎসর কার্ত্তিকমাসের শুক্লা একাদশী হইতে ৩দিন যে সমস্ত জাতি মন্দির স্পর্শ করিতে পারে তাহা আমার জানা ছিল না।’’ তখন ভগবানদাসজী বলিলেন ‘‘ধর্মগুরু তর্করত্ন মহাশয়ের সঙ্গে যখন রাজনীতিকগুরু গান্ধীজির আলোচনা হইতেছে তখন নিশ্চয়ই একটি সুফল ঘটিবে বলিয়া আমি ছুটিয়া আসিয়াছি এবং আমি অনুরোধ করি যে আপনি সেখানে আলোচনার দ্বারা তাহাদের মন্দির প্রবেশের ব্যবস্থা করুন।’’ তখন তর্করত্ন মহাশয় গুরুবায়ু যাইতে সম্মত হইলেন এবং বলিলেন যে গান্ধীজির সঙ্গে তাঁহার যে সকল আলোচনা হইয়াছে তাহা যেন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় এবং তাহাতে সেখানে আলোচনার সুবিধা হইবে। এইভাবে সে দিনের আলোচনা শেষ হয় এবং বোম্বাইতে লছমীরামের সহিতও কয়েকজন লোকের সঙ্গে তর্করত্ন মহাশয় ও আমি যাত্রা করিলাম গুরুবায়ুর দিকে। ২দিন ট্রেণে যাইয়া সেখানে উপস্থিত হইলাম। সেখানে তখন বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সংঘের অধিবেশ চলিতেছে। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি বহু গণ্য মান্য লোক উপস্থিত। শ্রীজীবন্যায়তীর্থ মহাশয়ও সেখানে ছিলেন। সেখানকার পরিস্থিতি অন্যরূপ। সেখানে অস্পৃশ্যতা অত্যন্ত বেসী। সেখানে জামোরিনের যুধরাজ ধর্মবীর দল গঠন করিয়াছে এবং জোর করিয়া কেহ মন্দিরপ্রবেশে উদ্যত হয় ধর্মবীর দল তাহার মাথা ফাটাইয়া দিবে। আমরা একটি দোভাষীর সঙ্গে অস্পৃশ্য বস্তিতে গিয়া তাহাদের মন্দির প্রবেশ সম্বন্ধে মত জানিতে চাহিলে তাহারা মন্দিরের দেবতাকে অত্যন্ত ভয় করে এবং কয়েকটি কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবক কেলাপ্পনের সত্যাগ্রহের তাগিদে বহু প্রলোভন দেখাইয়া আনিয়াছিল কিন্তু তারা মন্দির প্রবেশ ইচ্ছুক নয়। তাহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় পরণের কাপড় নাই এবং স্ত্রীলোকেরা বস্ত্রের অভাবে ঘর হইতে বাহির হইল না। ছোট ছোট পাল ঘর। তর্করত্ন মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনার বিষয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নাই। তথাপি তর্করত্ন মহাশয় আলোচনা করিলেন কিন্তু তাহারা সম্মত হয় নাই। ৬ দিন সেখানে থাকার পর আমরা বোম্বাইতে ফিরিলাম গুরুবায়ুর বাসায় প্রত্যহ সকালে একজন দোভাষী আসিত। তাহাকে ইংরাজীতে বলিলে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র একটি চাকরের দ্বারা আনাইয়া দিত।...

...বোম্বাই হইতে পুনরায় গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করার জন্য পুণায় গিয়া জেলে দেখা করিয়া তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন যে উভয়ের আলোচনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নাই, বলিলে উত্তরে গান্ধীজি বলিলেন যে যাহার উপর প্রকাশনার ভার ছিল তাহার অমনোযোগিতায় প্রকাশ হয় নাই। তখন তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন ‘‘আপনি অনর্থক একটি মন্দিরে প্রবেশ সম্বন্ধে এত ব্যাপার করিতেছেন কিন্তু সেখানে অচ্ছুতদের দুরবস্থার নিবারণে ও তাহার শিক্ষা দীক্ষার প্রসারের জন্য যদি চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে তাহাদের স্বভাব চরিত্রের উন্নতি হইত এবং সেজন্য বহু লোকের দরকার। আপনারা কিছু স্বেচ্ছাসেবক দিন এবং আমিও সেই সঙ্গে কিছু স্বেচ্ছাসেবক দিব। ইহারা তাগিদকে লেখাপড়া শিখাইয়া সভ্য শিক্ষিত করিয়া তুলিবে ও উহাদের ধর্মপ্রচারের ব্যবস্থা হইবে।’’ গান্ধীজি সম্মত হইলেন এবং পরে এসম্বন্ধে তাঁহাকে জানাইবেন বলিলেন। অনশনও এইভাবে শেষ হইয়া গেল। পরে আমি ও তর্করত্ন মহাশয় বোম্বাই হইতে কাশী আসিলাম ও ৩ দিন কাশীতে থাকিয়া ভাটপাড়া পৌঁছিলাম।...

এই বিবরণ যে সবদিক দিয়ে নির্ভুল তা নয়। পঞ্চানন তর্করত্নর সঙ্গে গাঁধির কথাবার্তা

সৃষ্টিসন্ধান

হয়েছিল ২৩ ডিসেম্বর ১৯৩২-এ। গাঁধি সেখানে তর্করত্নকে একটি আপস প্রস্তাব দিয়েছিলেন: মন্দিরে একটি নির্দিষ্ট সময়ে রজিনরা ঢুকুন, অন্য সময়ে বর্ণহিন্দুরা। কিন্তু এটি ছিল গোপন প্রস্তাব। প্রথমে তাই কাগজে বিবৃতি দেওয়া হয় নি। ৩০-১২-১৯৩২ -এ গাঁধি এ বিষয়ে তাঁর বিবৃতি দেন। দ হিন্দু -তে পরের দিন সেটি বেরয়। আপস প্রস্তাবটি গাঁধি খুলে বলেন অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইন্ডিয়া-র কাছে এক সাক্ষাৎকারে (২.১.১৯৩৩)। তাতে গাঁধির বেয়াই, রাজগোপালাচারী খেপে যাবেন— এমন আশঙ্কা করে গাঁধি তাঁকে একটি চিঠি পাঠান তার পরের দিনে। এইভাবে আরও দু-একজনের সঙ্গে চিঠিপত্র চলে।

বঙ্কিমচন্দ্র পাণ্ডা হয়তো এর কিছু খবর জানতেন, কিন্তু সব খবর রাখতেন না। যেমন, মন্দির প্রবেশের ব্যাপারে ২৮.১২.১৯৩২ -এ একটি গণভোট (রেফারেন্ডাম) নেওয়া হয়েছিল পোলানী তালুকে (গুরুবায়ুর মন্দির এরই অন্তর্গত)। ২৫,৫৬৮ হিন্দু ছিলেন আন্দোলনের পক্ষে ২৭৭৯ বিপক্ষে, ২০১৬ নিরপেক্ষ আর ৭০৬২ গণভোট -এ যোগ দেন নি। অর্থাৎ হিন্দুদের ৭৭ শতাংশ লোক অচ্ছুতদের মন্দির প্রবেশের অধিকার সমর্থন করেন।

এসব ঘটনার ক্ষেত্রে সাধারণত যা হয়, এখানেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। গুরুবায়ুর মন্দির সব জাতের মানুষের জন্য খোলা হলো কিনা, তর্করত্ন - গাঁধির যুক্ত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী কেরলের অচ্ছুতদের মধ্যে আদৌ কাজ শুরু করলেন কিনা— এসব প্রশ্নে সব পক্ষই নীরব। তবে ধরেই নেওয়া যায়: গোটা ব্যাপারটাই ধামাচাপা পড়ে গিয়েছিল; গাঁধি অনশন প্রস্তাব প্রত্যাহার করলেন: তাঁর ভক্তরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন আর বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সঙ্গ তথা রক্ষণশীল বর্ণহিন্দুরাও নিশ্চিন্ত হলেন। অবশেষে তেরো বছর পরে। ১৯৪৬-তে গুরুবায়ুর মন্দিরে অচ্ছুতরা ঢুকতে পারলেন!

তবে ২০০৫ -এ দাঁড়িয়ে পেছন দিকে ফিরে পুরো ঘটনাটি যতদূর সম্ভব বিনা পক্ষপাতে দেখলে একটি কথা বোঝা যায়: মন্দির প্রবেশ আন্দোলন, বিশেষ করে গুরুবায়ুর মন্দিরের ব্যাপারে, গাঁধির সঙ্কল্প আখেরে দলিতদের কোনো কাজেই লাগে নি। এই মন্দিরে ঢোকার দাবি দলিত সমাজের তলা থেকে ওঠে নি। আম্বেডকর প্রমুখ দলিত সম্প্রদায়ের কিছু নেতা এই সত্যাগ্রহ শুরু করেছিলেন সমান নাগরিক অধিকার ও মর্যাদার দাবিতে। কিন্তু মন্দির প্রবেশকেই তাঁরা তাঁদের আন্দোলনের একমাত্র, এমনকি মুখ্য লক্ষ্য বলে ধরেন নি। হিন্দু হিসেবেই তাঁরা নিজেদের পরিচয় দিতে চাইতেন, তার জন্যে সব পুকুরের জল তোলা ও সব মন্দিরের ঢোকার ব্যাপারে তাঁরা সত্যাগ্রহর কর্মসূচি নেন। বর্ণহিন্দু সমাজের গোঁড়া অংশর হৃদয় পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে গাঁধির উদ্যোগ স্বভাবতই সফল হয় নি। শেষ পর্যন্ত তাই আম্বেডকরকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিতে হলো। গৌতম বুদ্ধর পরিনির্বাণের ২০০৫তম জয়ন্তীতে ১৪ অক্টোবর ১৯৫৬ নাগপুরে একযোগে কয়েক হাজার দলিত বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিলেন। ফলে মন্দির -প্রবেশের অধিকার নিয়ে আর কোনো সমস্যাই থাকল না। যে অধিকারের জন্য দলিতরা সত্যাগ্রহ করে অত লাঞ্ছনা সহ্য করেছিলেন, সে-অধিকারের দাবি তাঁরা নিজেরাই ছেড়ে দিলেন। তার বদলে মহারাষ্ট্রের দলিতপ্রধান গ্রামে গ্রামে এখন দেখা যায় ছোটে ছোটা বুদ্ধমন্দির আর আম্বেডকারের মূর্তি।

পঞ্চানন তর্করত্ন তথা বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সঙ্ঘ যে মনোভাব দেখিয়েছিলেন, সেটিও ভালো কিছু নয়। সঠিক খবর জানা নেই, যুক্তি নেই, ন্যূনতম মানবিক উদারতা তো নেই-ই— আছে শুধ আপ্তবাক্যে আস্থা: পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের নারদ পাঞ্চরাত্র নামে কোন্ বইতে নাকি লেখা আছে গোটা মন্দিরটিই এক দেববিগ্রহ, সাক্ষাৎ দেবগুরু বৃহস্পতি আর হনুমানের বাবা, পবনদেব সেটি স্থাপন করেছিলেন। তাই যে করে হোক, সে-মন্দিরে দলিতদের ঢোকা রুখতে হবে — এই ছিল বর্ণাশ্রমীদের একমাত্র ধান্দা। দলিতদের আর্থিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত উন্নতির কথা আম্বেডকরও বলেছিলেন, ১০-০৬-১৯২৯-এ হরিজন কর্মী সম্মেলনের দিন হরিজনদের এক প্রতিনিধিদল নিয়ে ডি সুজা-ও গাঁধিকে একই কথা জানান। কিন্তু এবিষয়ে পঞ্চানন তর্করত্ন আম্বেডকারের সঙ্গে কথা বললেন না, বললেন শুধু গাঁধির সঙ্গে। দলিতদের অবস্থা ভালো করার ইচ্ছে যদি তাঁর থাকত তবে গাঁধিকে বাদ দিয়ে বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সঙ্ঘের উদ্যোগেই তো সে কাজ গোঁড়া হিন্দুরা করতে পারতেন। তাতে ভবিষ্যৎ ধর্মান্তরণ আটকানো যেত (যার মানে মূলত

সৃষ্টিসন্ধান

খ্রিষ্টান হওয়া), রাজনীতির চেহারাটাও ১৯৩০ ও ৪০ -এর দশকে অমন ঘোলাটে হয়ে পড়ত না।

গাঁধি সম্পর্কে তর্করত্ন বিরূপ মনোভাব নিয়ে ফিরে যান। গাঁধির মনোভাবও অনুকূল কিছু হয় নি । ১৭-১-১৯৩৩-এ অরুণচন্দ্র দত্তকে একটি চিঠিতে তিনি লেখেন: ''গুরুবায়ুর-এ তিনি (তর্করত্ন) কিছুই করতে পারেন নি। খুব একটা চেষ্টাও যে তিনি করেছিলেন তা আমার মনে হয় না। আমার মনে তিনি যে ছাপ ফেলে গেছেন তা হলো এই যে তিনি নিশ্চিত যে আমাদের পক্ষের কথাই অখণ্ডনীয়, কিন্তু হিন্দুত্বর শুদ্ধীকরণের সপক্ষে সতেজে দাঁড়ানো মতো সাহস তাঁর নেই।'' পঞ্চানন তর্করত্নর সঙ্গে এর পরেও গাঁধির চিঠি-চালাচালি হয়েছিল।

এ. কে. গোপালন (১৯০৪-৭৭) আর ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদ (১৯০৯-৯৮) ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের গোড়ার যুগের দুই কীর্তিমান পুরুষ। দুজনেই স্বাধীনতা আন্দোলনে কাজ শুরু করেছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও পরে কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টির মধ্যে থেকে। শেষে তাঁরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে আসেন।

গোপালন ও নাম্বুদিরিপাদ-এর কথা তুলছি এই জন্যে যে, গুরুবায়ুর মন্দির প্রবেশ আন্দোলনের সময় তাঁরা কংগ্রেস-এর নেতৃত্বে কেরলের গণ-আন্দোলনের চেহারাটি নিজের চোখে দেখেছিলেন। তাঁদের, বিশেষত গোপালন-এর স্মৃতিকথা থেকে গুরুবায়ুর সত্যাগ্রহের আরও একটি ছবি পাওয়া যায়।

১৯২১ -এ অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে বিরাট আশার সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু চৌরিচৌরা-র ঘটনার পরে গাঁধি হঠাৎই সে-আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে নেমে এল হতাশা। তবু কেরল -এর কিছু তরুণ কর্মী কংগ্রেসের ন্যূনতম কাজ চালিয়ে গেলেন, যদিও তাঁদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। গুরুবায়ুর সত্যাগ্রহের তরুণ কংগ্রেস কর্মীরাই ছিলেন প্রধান উদ্যোগী। যেমন ই.এম.এস. নাম্বুদিরিপাদ ছিলেন তার অন্যতম স্বেচ্ছাসেবক আর গোপাল ছিলেন সেই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক। কংগ্রেসের পুরনো বুর্জোয়া নেতারা আটঘাট বেঁধে কাজ করতেন: কোনোভাবেই যাতে সে আন্দোলনে কোনো বিপ্লবী চরিত্র না আসে। সনাতনীদের হৃদয় পরিবর্তন করে তবে মন্দির প্রবেশ আন্দোলন সফল হবে— তরুণ কর্মীরা এই 'ধীরে চলো' নীতি মানতে রাজি হন নি। তাঁরা তখুনি এর একটা হেস্তনেস্ত চেয়েছিলেন। গাঁধি নিজেও বুঝতেন: বুঝিয়ে সুঝিয়ে সনাতনীদের রাজি করানো যাবে না। ১৮-১২-১৯৩৬-এ ঘনশ্যামদাস বিড়লা -কে তিনি লিখেছেন: ''সব মন্দির খুলেছে এ তো খুবই ভালো কথা। কোচিন -এর মন্দিরগুলো খোলা দরকার— এ ব্যাপারে আমি একমত।''

নাম্বুদিরিপাদ মনে করেন: গুরুবায়ুর সত্যাগ্রহ ছিল এক দিকে অচ্ছুতদের সঙ্গে প্রগতিশীল বর্ণহিন্দুদের একত্র করার প্রচার আন্দোলন। কিন্তু অচিরেই এই সত্যাগ্রহ হয়ে দাঁড়াল সাম্রাজ্যবাদ -বিরোধী লড়াই থেকে গণতন্ত্রীদের শক্তিকে অন্য পথে চালিয়ে দেওয়া। ১৯৩২ এর হরিজন উন্নয়ন আন্দোলন আর ১৯৩৩ -এর কাউনসিল প্রবেশ কর্মসূচি ছিল লড়াকু সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কাজকর্ম বন্ধ করার সুপরিকল্পিত প্রকল্প।

অর্থাৎ কেলাপ্পন -এর সঙ্গে সঙ্গে গাঁধির অনশন ঘোষনার পেছনেও গাঁধির মাথায় একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। সেটি পুরোপুরি রাজনৈতিক; কেরলের রাজনীতিক অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে তিনি মন্দির প্রবেশের ব্যাপারে সব জাতের অধিকার নিয়ে আওয়াজ উঠিয়েছিলেন। তাঁরও উদ্দেশ্য ছিল দুটো—কেরলের সাধারণ মানুষের সংগ্রামকে ভুল পথে নিয়ে যাওয়া, আর আম্বেডকরের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নেওয়া। ঘটনার অনেক পরে নাম্বুদিরিপাদ তাই গাঁধির আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন ও তার সমালোচনা করেন। অন্যদিকে সনাতনীরা সনাতনীই থেকে যান— সতীদাহ রদ, বিধবা বিবাহ প্রচল ইত্যাদি ঘটনার সময় থেকে তাঁরা যে রক্ষণশীলতার ধারক ও বাহক ছিলেন, ১৯৪৭ এর আগে ও পরে (এই ২০০৫ এও) তাঁরা একই রয়ে গেছেন।

সৃষ্টিসন্ধান